ছোটগল্প

মৃত্যু অ-মৃত

কমল আচার্য

আমার মৃত্যুর খবর এ মুহূর্তে আমার দু'হাতে। এ রকম আশ্চর্য ঘটনা আমার আর জানা নেই। আজ সকালে উত্তরবঙ্গের একটা বহুল প্রচলিত বাংলা সংবাদপত্রে আমার মৃত্যুর খবর বেরিয়েছে। কাগজটিতে আমার একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবিও ছাপা হয়েছে। সকাল থেকে ফোনের পর ফোন, পাড়ার মানুষজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বাড়ির উঠোনে। অনেকেই ঘরে ঢুকে দু'টো কথা বলে গিয়েছে। ওদের অনেকেই বলে গিয়েছে আমার আয়ু নাকি বেড়ে গেল। এ রকম অঘটন কী করে ঘটল, আমার ছবি সংবাদপত্রে অফিসে কী করে পৌঁছল, কেউ বুঝতে পারছে না। আমিই কি ছাই বুঝতে পারছি, এই অনাসৃষ্টি কী করে ঘটল।

আমি সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়। বয়স একত্রিশ, গ্রামের একটা জুনিয়র হাইস্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। আমার বাবাও স্কুলশিক্ষক ছিলেন, আমার আট বছর বয়সে বাবা মারা যান। আমার এক দিদির বিয়ে হয়েছে মালদায়, আজ প্রায় সাত বছর হতে চলল। পরিবারে এখন মা, আমি আর দূর সম্পর্কের এক বিধবা মাসি। মা পুরোনো দিনের মানুষ, ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, মাসির সামান্য অক্ষর জ্ঞানটুকু আছে। নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিপ্রিয় একটি পরিবার হিসেবে পাড়ার লোক আমাদের চেনে।

মা আমাকে সমু বলে ডাকে। পাড়ার মানুষজন, স্কুলের সহকর্মীদের কাছে আমি সমর, সমরবাবু, ক্বচিৎ কেউ সমরেন্দ্র বলে উল্লেখ করে। স্কুলের খাতায় অবশ্য আমি সমরেন্দ্র ঘোষ রায়, সংক্ষেপে এস এন ঘোষ রায় – যে ভাবে আমি সই করি।

প্রতিদিন মতো আজ সকালেও চায়ের কাপ হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি। আর কাগজের প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠি। অর্ধেক চা ছলকে পড়ল, আর একটু হলে পুরো কাপটাই হাত থেকে ছিটকে পড়ত। চায়ে মুখ দেওয়া আর হল না। প্রথম পাতার বামদিকে এক কলাম জুড়ে খবরটা প্রকাশিত হয়েছে। খবরের মাঝামাঝি জায়গায় আমার ছবি।

দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে যুবকের মৃত্যু

খবরের প্রথম লাইনটা – এক কিশোরীকে ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচাতে খুন হতে হল এক যুবককে। নিহত যুবকের নাম সমর ঘোষ, বয়স আনুমানিক ত্রিশ। পেশায় গৃহশিক্ষক। শহর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব ...।

এক নিঃশ্বাসে খবরটা পড়ে ফেললাম। তারপর দৌড়ে টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিলাম। রাতে শোয়ার আগে ফোনটা মিউট করে রাখি। অন করতেই দেখি সতেরোটা মিস কল, দিদি-জামাইবাবু থেকে, হেড স্যার, স্কুলের সহকর্মী-বন্ধু সবাই আছে। ফোনটা হাতে নিয়ে কাকে প্রথম ফোন করব, কী বলব কিছুই মাথায় আসছিল না। কললিস্ট দেখতে দেখতে দীপাঞ্জনের নাম দেখে, প্রথমে ওকেই বেছে নিলাম। বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে, আমার কলেজ-ইউনিভার্সিটির প্রিয় বন্ধু, এল আই সি-র ডেভেলপমেন্ট অফিসার। মাসে চারটে রবিবার ওর সঙ্গে দেখা হয়, আড্ডাও হয়। রিং হতেই ওপার থেকে দীপের জোরালো গলা, কী রে শালা, বেঁচে আছিস তো! প্রথমে আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিলাম, নাম আর চেহারা দু'টোই মিলে যাচ্ছে। কী করে সম্ভব! বুকের ভিতরটা ধক করে উঠেছিল। দু'দিন আগেই সন্ধেবেলা তোর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারলাম, গতকাল কী এমন ঘটল, তোকে ওই বাঁধের ধারে খুন হতে হল। খবরটা ভালো করে পড়ে বুঝলাম, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। তখনই তোকে ফোন করেছিলাম। এনিওয়ে, তুই ইমিডিয়েট সংবাদপত্র অফিসে একটা ফোন কর।

আর তোর স্কুল না থাকলে আমার অফিসে চলে আয় সাড়ে দশটার মধ্যে।

হেডস্যারকে ফোন করে খবরটা জানালাম, আজ আমি স্কুলে যাচ্ছি না। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসছিল না, আমার ছবি কী করে ওই খবরের সঙ্গে ছাপা হল। অনেক কৌতূহলী চোখের বাধা অগ্রাহ্য করে দীপাঞ্জনের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ও বলল, সকালে নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে আসিসনি, আমাদের ক্যান্টিনে ডিমটোস্ট আর মিষ্টি দিয়ে টিফিনটা সেরে নে। চা খেতে খেতে তোর সঙ্গে কথা বলছি।

...

টুয়েলভ ক্লাসের পড়ুয়া গীতা নামের যে কিশোরীকে কেন্দ্র করে খুনোখুনি ঘটে গেল, তার বাড়ি তিস্তা নদীর বাঁধের চরে। গীতার বাবা সুবলচন্দ্র মণ্ডল সামান্য সব্জি বিক্রেতা। বাঁধের চরে নেতাজিনগর কলোনি। নিহত যুবক সমর ঘোষ সেই কলোনির ছেলে। শান্ত-নির্বিরোধী পড়ুয়া ছেলে হিসেবে সমর কলোনিতে পরিচিত। গৃহশিক্ষকতা পেশা। গীতা তার কাছে পড়তে যেত। ঘটনা সন্ধেবেলার। টিউশন শেষে গীতা সাইকেলে ফিরছিল। বাঁধের ধারে অন্ধকারে কিছু যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওর সাইকেল আটকে দাঁড়ায়। নির্জন অন্ধকারে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে ওকে ঘিরে ধরে। কিশোরী চিৎকার করে ওঠে। কয়েক জোড়া হাত তৎপরতার সঙ্গে কিশোরীর গলা-মুখ চেপে ধরে। একসময়ে নেশাগ্রস্ত যুবকরা নির্জনতার সুযোগে মেয়েটির সাইকেল ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে নির্জন চরের দিকে। মেয়েটির চিৎকার শুনে সমর ছুটে আসে, প্রতিবাদ করে, ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ছেলেগুলি তখন উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সমরের উপর। গলায়-কাঁধে ভোজালির সাতটা কোপ খেয়ে সমর ওখানেই লুটিয়ে পড়ে। ওই দুষ্কৃতীদের দু'জন ধরা পড়লেও, বাকি তিনজন পলাতক, পুলিশ ওদের খুঁজছে। অনুসন্ধানে পুলিশ জেনেছে, এই যুবকেরা ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাদক-কারবারের সঙ্গে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করে যাচ্ছে।

খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে এই খবরের সঙ্গে এলাকার কিছু ব্যক্তির মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে আমার পাসপোর্ট ছবি। ছবির নীচে লেখা নিহত যুবক সমর ঘোষ।

বাঁধের ধারে একটা গাছের নীচে বাইক রেখে আমি আর দীপাঞ্জন সিগারেটের খোঁজে একটা ছোট ঝুপড়ি দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। দোকানদারের সঙ্গে কথায় কথায় বেশ কিছু তথ্য আবিষ্কার করলাম।

তিস্তা বাঁধের এপারে অন্ধকার, ওপারে ঝলমলে জেলাশহর। জেলাশাসকের অফিস, এসপি-র বাংলো থেকে মাত্র আধ কিলোমিটার দূরত্বে বাঁধের ওপারে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মরা-নদীর বুকে শুকনো বালি আর বালি। এই ধূ ধূ বালির মাঝে কলোনির কিছু লোক হুক করে বিদ্যুৎ চুরি করে দিব্যি ছোট-ছোট দোকান, ঝুপড়ি ঘরে আলো জ্বালছে, টিভি দেখছে, মোবাইল চার্জ করছে। রাতের অন্ধকারে নিঝুম বালির চড়ে গড়ে উঠেছে ড্রাগ আর দেশি মদের ব্যবসা, পাশাপাশি দেহ-ব্যবসাও রমরমিয়ে চলছে।

নিহত সমর ঘোষের চেহারা কেমন, ওর পরিবারে কে কে আছেন, প্রকৃত ঘটনাটা কী, কেন তাকে খুন হতে হল, এ রকম অনেকগুলি কৌতূহল আর প্রশ্ন নিয়ে দীপ আর আমি এসেছিলাম, কিন্তু কলোনির থমথমে পরিবেশ দেখে ওদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে সাহস করলাম না।

বাইকে ফিরছি। মোবাইল বেজে উঠল। অরুণাংশুর ফোন। আমার স্কুলের সহকর্মী, প্রায় আমার বয়সি, বাংলার টিচার। অরুণাংশু আর বায়োলজির নারায়ণ – স্কুলে এই দু'জনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। আমার বিয়ের পাত্রী নির্বাচনে ওরা স্বেচ্ছায় কিছুটা দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে। অরুণাংশু বলল, শোন, তুই এক্ষুণি একবার আমার বাড়ি চলে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে, জরুরি। বাড়ি এলে সব বলব।

ডাকবাংলো রোডের মোড়ে দীপাঞ্জন বাইক থামিয়ে আমাকে নামিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। আমার প্যান্টের পকেটে ভাঁজ করা সেই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা, যেখানে জ্বলজ্বল করছে আমার মৃত্যুর খবর। কী বলব একে, ভাগ্যের পরিহাস, নাকি অন্যকিছু! গলির দু'পাশে জোনাকির জ্বলে ওঠা-নেভার মধ্যে স্মৃতির দরজা যেন ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল। অরুণাংশুর বাড়ির গলিতে ঢোকার সময় হঠাৎ কলেজের প্রথমদিকের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে বরফ-চাপা রঙিন দিনগুলি, দীর্ঘ রক্তক্ষরণে বিবর্ণ প্রথম ভালোবাসার দিনগুলি প্রেতমূর্তির মতো চারপাশে জেগে উঠল। একটা শ্বাসরোধকারী অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে পিষে ফেলতে চাইছে।

আজ থেকে দশ বছর আগে এ রকম মৃত্যুই আমার প্রত্যাশিত ছিল, স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমার ভীরুতা, কাপুরুষতা, বাস্তবকে স্বীকার না করার প্রবণতা মৃত্যুকে এড়িয়ে গিয়েছে।

গীতিকাকে আমি গীতা বলেই ডাকতাম। গীতিকা চ্যাটার্জি, ছিপছিপে চেহারা, লম্বা বিনুনি কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, মিষ্টি গানের গলা, নরম তুলতুলে কথা – সব মিলিয়ে ও ছিল সেই দিনগুলির আমার বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা। গভীর একটা ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল মেয়েটাকে ঘিরে সেই কলেজের প্রথমদিকের দিনগুলিতে। ওকে দেখলেই

তিস্তা বাঁধের এপারে অন্ধকার, ওপারে ঝলমলে জেলাশহর। জেলাশাসকের অফিস, এসপি-র বাংলো থেকে মাত্র আধ কিলোমিটার দূরত্বে বাঁধের ওপারে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মরা-নদীর বুকে শুকনো বালি আর বালি